# ভূমিকা

ত্রিতাপদগ্ধ জীবের দুঃখে করুণায় বিগলিত হইয়া যে অখণ্ড এবং অনির্বচনীয় পরব্রহ্ম ভগবৎশক্তির গোমুখ হইতে প্রবাহিত হইয়া মন্দাকিনীর প্রবহমান স্রোতধারার ন্যায় মানবের জীবনের উভয়কূলকে বিপুল আধ্যাত্মিক শস্য পর্যাপ্তির সম্ভাবনায় উজ্জ্বল করিয়া পরিপূর্ণতার আপ্তির দিকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ঊনবিংশ শতকে একটি মনুষ্য শরীরের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল—তাঁহার নাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। এই শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠ হইতেই উৎসারিত হইয়াছিল বেদবাণী যাহা সেই কালের বহু জ্ঞানী-গুণী মানবকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং তাঁহাদের জীবনকে আমূল সংস্কৃত করিয়া অমৃতত্বলাভের পথের সন্ধান দিয়াছিল। কিন্তু সেই বাণী যাহা তাঁহার কণ্ঠ হইতে সর্বদাই উদ্‌গীরিত হইত তাহার কোন অনুলিপি করা হয় নাই এবং তাহা সম্ভবও ছিল না। একমাত্র শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা মাস্টার মহাশয় যে স্বল্পসংখ্যক দিনে উপস্থিত থাকিতেন তিনি তাঁহার প্রাত্যহিক দিনপঞ্জীতে শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু কথা ও উপদেশ সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্তিকালে তিনি সেই সূত্রগুলিকে ধ্যানের দ্বারা ও তাঁহার প্রখর স্মৃতিশক্তির দ্বারা অনুলিখিত করিয়া প্রথমে একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। সেই পুস্তিকা পাঠ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ একটি পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, ''আপনার এই প্রকাশনের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। পুস্তিকাকারে প্রকাশে খরচ পোষাবে না সেই অসুবিধা। এ বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। অর্থ আসুক বা না আসুক ইহা দিবালোকে প্রকাশিত হোক।'' সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ পূর্বে লিখিয়াছিলেন, ''এক লক্ষ ধন্যবাদ মাস্টার! আপনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে আঘাত করেছেন। হায়! অতি অল্প লোকই তাঁকে বোঝে।'' স্বামীজী অপর একটি চিঠিতে একটি অতি তাৎপর্যময় উক্তি করিয়াছিলেন—''সক্রেটিসের সংলাপের আগাগোড়াই প্লেটো। আর আপনি আছেন অন্তরালে। তদুপরি নাটকীয় অংশ অসামান্য সুন্দর।'' স্বল্প কয়েকটি কথায় স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিরাট আলোচনার ব্যঞ্জনা দিয়াছেন। অল্প পরিসর ভূমিকাতে এই বিষয়টির সম্যক আলোচনা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ সক্রেটিস তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার প্রধানতম শিষ্য প্লেটো একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন যাহা 'প্লেটোর কথোপকথন' নামে বিখ্যাত। এই গ্রন্থে প্লেটো তাঁহার গুরু সক্রেটিসের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির যে কথোপকথন তাহার ভিতর দিয়া কতকগুলি দার্শনিক মতকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, এইগুলি কি সক্রেটিসেরই অভিমত? Frank Thilly (ফ্র্যাঙ্ক থিলি) তাঁহার 'দর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ''সক্রেটিস কোন দর্শনতত্ত্ব প্রস্তুত করেন নাই, জ্ঞানতত্ত্বও উপস্থাপিত করেন নাই। আচরণবিধি সম্বন্ধেও কোন তত্ত্বের অবতারণা করেন নাই।'' তাঁহার শিষ্যদের তাঁহার কথোপকথনের মধ্য দিয়া (Socratic method-এ) সেই আলোচনায় কোন সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহাই তিনি নির্ধারণ করিতেন। কিন্তু শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাঁহার গুরুর মুখনিঃসৃত যে বাক্যগুলি তাহাই তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। নিজের বিচারবুদ্ধিকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া অপরের কথোপকথন পরিশুদ্ধভাবে অনুলিখন সত্যই একটি বিস্ময়ের বস্তু। এ পর্যন্ত যত দর্শন বা জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এইরূপ কোন গ্রন্থ আছে কিনা সন্দেহ। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুরের ভাষাকে কলিকাতার ভাষাতে রূপান্তরিত করিয়া তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তবুও তাহাতে ভাবগত কোন বৈষম্য আছে বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যগণের কেহই অনুযোগ করেন নাই। গ্রন্থটির নাম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' রূপে পরে শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত গ্রহণ করেন। তিনি গ্রন্থের প্রথমেই শ্রীমদ্ভাগবতের একটি উদ্ধৃতি দিয়াছেন—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ বঙ্গভাষায় এই শ্লোকের অর্থ—তোমার কথামৃত তাপদগ্ধ জনগণের জীবনস্বরূপ, মুনিগণ কর্তৃক কীর্তিত, পাপসমূহের

www.udbodhan.org

বিনাশক, শ্রবণমাত্রই মঙ্গলপ্রদ ও সকল সম্পদের আকর। ইহা যিনি বিস্তৃতরূপে কীর্তন করেন, জগতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

এই স্থানে 'কথামৃত' শব্দটির অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। ইহার অর্থ কি শ্রীভগবানের চরিতকথা বা তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী? শ্রীধর স্বামীর টীকায় মনে হয় যে এই কথা তাঁহার চরিতকথাই। কিন্তু 'শ্রীম' ইহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের যে সমস্ত বাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে রহিয়াছে তাহাতে ধর্ম দর্শন জাগতিক ব্যবহার প্রভৃতি বহু বিষয়ের সঙ্গে তাঁহার জীবনের বহু ঘটনাও সন্নিবেশিত আছে। এইজন্যই বোধহয় প্রখ্যাত লেখক অলডাস হাক্সলি এই গ্রন্থটিকে 'Hagiography'—এই অভিধায়ে অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ Hagiography শব্দটির অর্থ 'সাধুসন্তদের জীবনচরিত'। কিন্তু এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচরিত গৌণ, ইহাতে তাঁহার উপদেশ এবং কখনো কখনো সেই উপদেশের প্রতিষ্ঠাভূমিরূপে নিজ চরিতের বর্ণনা আছে। এরূপ বর্ণনা পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থে আছে কিনা সন্দেহ। সেইজন্যই স্বামীজী বলিয়াছিলেন, ''আমাদের গুরু এবং প্রভু এতই মৌলিক যে আমাদের প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বপূর্ণ হইতে হইবে নয়ত কিছুই নয়।'' সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'শ্রীম'র এই যে বিখ্যাত গ্রন্থ সেটি একটি অপূর্ব সৃষ্টি এবং অতুলনীয়।

ইহার পরে যে ভাগবতী শক্তির জাহ্নবীধারার মনুষ্যরূপ পরিগ্রহের কথা বলিয়াছিলাম সেই ব্যক্তি-মনুষ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। দেশকালনিমিত্তের ঊর্ধ্বে যে অদ্বৈতসত্তা বিরাজমান তাহার কি কখনো দেহগ্রহণ সম্ভব? আমরা এই জগতে যখন অধিষ্ঠান করি তখন এই জগৎকেই মনে হয় বাস্তব এবং আমাদের দেশকালনিমিত্ত পরিব্যাপ্ত যে মন সে এই বিশ্বের কারণের অনুসন্ধান করে। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহারা ঈশ্বর-সত্তা কল্পনা করে যিনি এই জগতের স্রষ্টা, পাতা এবং লয়কর্তা। কিন্তু আমাদের যে জগৎ সে জগৎ কি ত্রিকালাবাধিত সত্য? যখন আমরা রজ্জুতে সর্প দর্শন করি তখন সেই সর্প, যতক্ষণ সর্পজ্ঞান থাকে ততক্ষণ সর্পই। তাহারও একটা সত্যতা আছে। কিন্তু সেই অনুভূতিকে বলা হয় প্রাতিভাসিক। তাহার উপরের যে সত্য সেসত্য স্বপ্নকালে বা সুষুপ্তিকালে থাকে না। সেইজন্যই অবস্থাত্রয় বিচার করিলে ইহাই বলিতে হইবে এই ব্যবহারিক জগতের সত্তা সার্বকালিক, সার্বদেশিক বা সার্বজনিক নয়। তাই এই জগতের কেবল ব্যবহারিক সত্তা রহিয়াছে বলা হয়। এক অখণ্ড অদ্বৈত সত্তা কিরূপভাবে বহুত্বে পরিণত হইল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে বলিতে হয় তাহা আমরা জানি না বা বলিতে হয় ইহা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট, যে মায়ার অর্থ স্বামীজীর ভাষায়, ''statement of facts'' বা ঘটনার বর্ণনামাত্র। ভগবান শঙ্করাচার্য একই কথাই তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে বলিয়াছেন, ''নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ''—লোকের ব্যবহারের স্বাভাবিক প্রকাশ। কিন্তু তবুও যখন আমরা এই ব্যবহারিক রাজ্যে থাকি, কার্যকারণের অনুসন্ধান করি তখন আমরা এই কল্পনা করি যে, মায়াশক্তি—যিনি ঈশ্বরের শক্তি—তাঁহারই সাহায্যে ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মায়া ঈশ্বরের অধীন, ঈশ্বর মায়াধীশ, মায়া তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু জীব মায়াধীন বলিয়া মায়া বা অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন। সেইজন্যই সে সুখ-দুঃখের দ্বারা অভিভূত, জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে আন্দোলিত, জরা এবং ব্যাধির দ্বারা পীড়িত। সেই সমস্ত দুঃখ হইতে, দুঃখের অভিঘাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনা সে করে। ইহাই তো ব্যষ্টিগতভাবে ঈশ্বর-অস্তিত্ব স্বীকার করিবার হেতু। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সমগ্র জগতে যখন সময়ের আবর্তনে ধর্মের গ্লানি ঘটে তখন বৈদিকযুগে আধিকারিক পুরুষ এবং পরের যুগে অবতার পুরুষের আবির্ভাব উল্লিখিত হইয়াছে। এই অবতার মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মানুষকে সত্যের পথে, ঋতের পথে, কল্যাণের পথে লইয়া যাইবার উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব তিনি কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ, এবং ক্ষুদ্র মনুষ্য দেহ ধারণ এবং

w w w . u d b o d h a n . o r g

মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিতে পারেন? ভগবান শঙ্করাচার্য ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, "যেন তিনি দেহবান হন, যেন তিনি জাত হন।" তিনি মায়ার অধীশ্বর বলিয়া সাধারণ মনুষ্যের মতো সুখ-দুঃখের দ্বারা অভিভূত হন না। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ"। অনেক অবতার এই পৃথিবীতে জীবের ত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে সুপরিচিত নাম—রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি।

ঊনবিংশ শতকে চার্লস ডারউইন, চার্লস লায়েল (Lyell), হাক্সলী প্রমুখ মনীষিগণ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্বীকৃতি প্রচার করিলেন। যখন চারিদিকে বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থানে মানবজীবন উদ্‌ভ্রান্ত সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ ও পটভূমিকা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"তখন আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সততবিবদমান, আপাতপ্রতীয়মান-বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী, আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম-নামক যুগযুগান্তব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ড-সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন-ধর্মের সার্বলৌকিক, ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন-ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ লোকহিতের জন্য আপনাকে প্রদর্শন করিতে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"অনাদি-বর্তমান সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্ত-সংস্কার ঋষিহৃদয়ে আবির্ভূত হন, তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে শাস্ত্রপ্রমাণীকৃত হইলে ধর্মের পুনরুদ্ধার, পুনঃস্থাপন ও পুনঃপ্রচার হইবে, এইজন্য বেদমূর্তি ভগবান এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।

"বেদ অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মের এবং ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ধর্মশিক্ষকত্বের রক্ষার জন্য ভগবান বারংবার শরীর ধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

"প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়; পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়। প্রত্যেক পতনের পর আর্যসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্যবান হইতেছে—ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

"প্রত্যেক পতনের পর পুনরুত্থিত সমাজ অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছেন; এবং সর্বভূতান্তর্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

"বারংবার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।

"কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্তমান গভীর বিষাদ-রজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন-সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

"এবং সেইজন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।

"পতনাবস্থায় সনাতন ধর্মের সমগ্র ভাব-সমষ্টি অধিকারিহীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আকারে পরিরক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

"এই নবোত্থানে নববলে বলীয়ান মানবসন্তান বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টিকৃত করিয়া ধারণা ও অভ্যাস

w w w . u d b o d h a n . o r g

করিতে সমর্থ হইবে এবং লুপ্তবিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে; ইহার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ শ্রীভগবান পরমকারুণিক, সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাবসমন্বিত, সর্ববিদ্যা-সহায় যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

"অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্তভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

"এই নবযুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান এবং এই নবযুগধর্ম-প্রবর্তক শ্রীভগবান পূর্বগ শ্রীযুগধর্মপ্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।

"মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও।

"যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর।

"আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক—এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।"

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতারবরিষ্ঠ বলিয়াছেন। এই বলার হেতু যে, যাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" তাঁহাকেও স্বামী বিবেকানন্দ পরিপূর্ণ প্রকাশ বলিয়া মনে করেন নাই। এইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে লিখিয়াছেন তাঁহার স্বকীয় চলতি ভাষায়, "ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা, তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই,...দাদা, বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-ভাগবতে যে কি আছে, তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in on life the whole cycle of the national religious existence in India. (তাঁহার জীবন অনন্তশক্তিপূর্ণ একটি সন্ধানী আলো; ইহা ভারতের সমগ্র ধর্মভাবের উপর বিচ্ছুরিত হইয়াছে। তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ ছিলেন এবং এক জীবনে ভারতের জাতীয় ধর্মজীবনের সমগ্র কল্পটি অতিবাহিত করিয়াছেন।)

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস the latest and the most perfect—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট; কারুর সঙ্গে কি তাঁহার তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না, তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস। এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁহার একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস-দাস-দসোঽহম্।তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এইজন্য চটি। তাঁর নাম বরং ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ (শিক্ষা) ফলবতী হোক। তিনি কি নামের দাস?

"ভায়া, যীশুখ্রীস্টকে জেলে-মালায় ভগবান বলেছিল, পণ্ডিতেরা মেরে ফেললে, বুদ্ধকে বেনে-রাখাল তাঁর জীবদ্দশায় মেনেছিল। রামকৃষ্ণকে জীবদ্দশায় নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরীর শেষভাগে ইউনিভার্সিটির ভূত ব্রহ্মদত্যিরা ঈশ্বর বলে পূজা করেছে।...হাজার হাজার বৎসর পূর্বে তাঁদের (কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট প্রভৃতির) দু-দশটি কথা পুঁথিতে আছে মাত্র। 'যার সঙ্গে ঘর করিনি, সেই বড় ঘরনী'—এ যে আজন্ম দিন রাত্রি সঙ্গ করেও তাঁদের চেয়ে ঢের বড় বলে বোধ হয়, এই ব্যাপারটা কি বুঝতে পারো, ভায়া?"

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বেও শ্রীরামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেকে তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু

www.udbodhan.org

তাঁহাদের এই প্রচার প্রসার লাভ করে নাই, কেননা তাঁহারা নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁহার প্রতি তাঁহাদের জীবনের বিশ্বাসের কথাই বলিয়াছিলেন; এবং তাঁহার আবির্ভাবের যে রহস্য এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ ব্যাপ্তি ও পরিণাম সম্বন্ধে তাঁহারা সচেতন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালেই তিনি কতিপয় যুবককে নির্বাচিত করিয়া ধীরে ধীরে গৃহস্থভক্তগণ হইতে একটি পৃথক ধরনের জীবনযোগের শিক্ষা দিয়া একটি ত্যাগী এবং সন্ন্যাস জীবনের উপযোগী সংঘ সৃষ্টি করিতেছিলেন। এ সম্বন্ধেও গৃহিভক্তগণ সম্যক্‌রূপে অবহিত ছিলেন না। কাশীপুর বাগান বাড়িতে যখন এই যুবসম্প্রদায় ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুশাসনে ত্যাগে তপস্যায় এবং গুরুসেবাকার্যের মধ্য দিয়া বিপুল অধ্যাত্মশক্তির অধিকারী হইয়া গঠিত হইতেছিলেন তখনও গৃহীভক্তদের ইহা বোধগম্য হয় নাই যে ইহারাই ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়া একটি বিরাট সংঘে পরিণত হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পর সেইজন্যই শ্রীরামচন্দ্র প্রমুখ ভক্তরা যুবক ভক্তদের স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বাভাবিক জীবনযাপন করিতে উৎসাহিত করিলেন। তাঁহাদের মতে যাঁহাদের জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ আশীর্বাদপূত তাঁহাদের জীবন সাধারণ সংসারী হইতে পৃথক ধরনের হইলেও সেই জীবন সংসারে থাকিয়াই অন্যান্য লোকেদের প্রভাবিত করিবে।

যাহা হউক, ইহা অবধারিত সত্য যে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তজনের অধিকাংশই তাঁহাকে শ্রীভগবানের অবতারস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইঁহাদের মধ্যে 'শ্রীম' যখনই উপস্থিত থাকিতেন তখনই তাঁহার কথোপকথনের বিষয় সম্বন্ধে সচেতন থাকিতেন এবং প্রত্যহ যাহা শুনিতেন তাহাই দিনপঞ্জীতে নিবদ্ধ করিতেন। শ্রীতারকনাথ (পরে স্বামী শিবানন্দ) যখন ওইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বসিয়া একটি খাতাতে তাঁহার উপদেশ লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, উহা তাঁহার কাজ নয়, উহা মাস্টার প্রভৃতি অন্যান্যদের কাজ। এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বাণীর অনুলিখন তিনি চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাহা করাইতে চাহিলেন মাস্টার মহাশয় বা শ্রীম'র মাধ্যমে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে শ্রীমকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাহিতেন তিনি কি কি শুনিয়াছেন এবং কি বুঝিয়াছেন। শ্রীম'র পরম ভাগ্য যে তিনি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন। তিনি উহা সম্পন্ন করেন, রোমাঁ রোলাঁর ভাষায়, "লঘুলিপির মতো বিশ্বস্ততার সঙ্গে।" সেইজন্যই এই গ্রন্থের জগতের ধর্ম-সাহিত্যে একটি অপূর্ব ও মূল্যবান স্থান রহিয়াছে। কোন ধর্মীয় মহাপুরুষের বাক্যসমূহের অনুলিপিকার তাঁহার মতো হইয়াছিল কিনা তাহা বলা দুরূহ। শ্রীম'র দক্ষিণেশ্বরে প্রথম বা দ্বিতীয় আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই এই অনুলিপি গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীম ছিলেন সংসারী মানুষ। তিনি সাধারণতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ছুটির দিনে বা অন্য কোন অবসরে আসিতেন, যখন তাঁহাকে সংসারের কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইত না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের শেষদিকে শ্রীম ১৮৮২ খ্রীঃ হইতে ১৮৮৬ খ্রীঃ পর্যন্ত তাঁহার নিজের উপস্থিতির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন তাহা দেখিলেই বোঝা যায়। তিনি গার্হস্থ্য জীবনে থাকিয়াও কিভাবে অধ্যাত্মজীবনের পথে চলিতে পারা যায় তাহারই পথ নির্দেশ করিয়াছেন। তবে সেই কথার মধ্যেও, ধর্মপ্রসঙ্গের মধ্যেও, ধর্মীয় আচরণের মধ্যেও, কিছু কিছু দার্শনিক তত্ত্ব বা সন্ন্যাসজীবনের যে আদর্শ তাহাও আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ শ্রোতাই সেখানে গৃহস্থ এবং সেইজন্য আলোচনার বিষয়বস্তু তাঁহাদের উপযোগী হইত। তিনি নানাস্থানে গার্হস্থ্যজীবনকে কেল্লার ভিতরে থাকিয়া যুদ্ধ করার উপমায় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতের চিরন্তন যে আদর্শ যাহা ধর্মমূল তাহার কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। গার্হস্থ্য জীবনেও সংযমের প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন এবং দু-একটি সন্তানের জন্মের পর দম্পতি যেন ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় বাস করে তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দর্শনের পর শ্রীম'র একটি পুত্রের জন্ম হওয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম'র উপর একটু বিরূপ

www.udbodhan.org

হইয়াছিলেন। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে শ্রীম হইতেছেন ''ভূরিদা জনাঃ''। তিনি ভগবানের এই কথামৃত বিতরণ করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ দাতার পর্যায়ে অধিরূঢ় হইয়াছেন এবং মানুষের তাপদগ্ধ জীবনে অমৃতবারি সিঞ্চন করিয়াছেন। এইজন্য যাঁহারা ধর্মজীবনে অধিরূঢ় বা ধর্মজীবনযাপনে আগ্রহী তাঁহাদের নিকট এই গ্রন্থের পাঠ অপরিহার্য। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ কথ্য ভাষায় ধর্মজীবনের প্রতি উচ্চ তত্ত্বের ব্যাখ্যা যাহা সাধারণ মানুষকে ধর্মের প্রবেশপথ উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় তাহা এই মহাগ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে পাওয়া সম্ভব। তাঁহার অমৃত-নিষ্যন্দিনী-বাণী-প্রবাহিনী মৃতকল্প মানবজাতিকে নবজীবন দান করে এবং তাহার জীবনের কল্মষ দূর করিতে সাহায্য করে। ইহার শ্রবণে মানবের মঙ্গল এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করিলে ইহাই বোধ হয় যে, ইহা কবির দ্বারাই কথিত। লৌকিক অর্থেও শ্রীম ছিলেন কবি, এবং বৈদিক অর্থেও তিনি যে অধ্যাত্মজীবনের একজন দ্রষ্টা ছিলেন রামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করিলে এ-বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপদেশই তাঁহার একমাত্র অবদান নয়। তিনি তাঁহার নিজের অন্তরঙ্গজনকে শিক্ষা দিয়া, কৃপা দিয়া তাঁহাদের জীবনকে গঠিত করিয়া দিয়াছেন। বাংলা ভাষার একজন নট ও নাট্যকার শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপার কথা বলিতে গিয়া একটি কবিতায় লিখিয়াছেন—

কর্মফলে ভ্রাম্যমাণ জন্ম-মৃত্যু মাঝে,
নহে নিবারণ,
দিয়ে স্থান ভগবান শ্রীচরণ রাজে
তার নরে কপালমোচন;
নিরন্তর ত্রিতাপদহন,
দণ্ড করে পশ্চাতে শমন;
কর্মফল নিজ দেহে, সহিয়া অপার স্নেহে,
ক'র দূর শমন-শাসন,
বার ত্রাস, হর পাশ ত্রিতাপ হরণ!
মোক্ষলুব্ধ হয় চিত্ত তোমার পরশে,
ভোগে তৃণ জ্ঞান,
প্রেম-ভ্রমে কাম-রসে আর নাহি রসে,
দুঃখ সুখ নেহারে সমান;
ঠেলে পায় ধন-জন-মান,
আত্মতত্ত্বের নিয়োজিত প্রাণ;
বিবেক হৃদয়ে ফোটে, বিষয় বন্ধন টোটে,
বৈরাগ্য-আলোক দৃশ্যমান,
আত্মা হেরে আপনারে—নহে অনুমান।

যিনি এই অপূর্বভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপার নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন সেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ জগতের এমন কিছু দুষ্কর্ম নাই যাহা করেন নাই; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার জীবন পরিবর্তিত হইয়া গেল। এই ভাবেই তখনকার কলিকাতার সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শ্রবণ করিয়া নিজের জীবনের দিশারী পাইয়াছে, ভগবৎ পথে চলিবার অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে এবং অনেকে অধ্যাত্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

www.udbodhan.org

ইহাদের মধ্যে প্রখ্যাত বাগ্মী এবং বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকেশবচন্দ্র সেন হইতে কালীবাড়ির মেথর রসিক পর্যন্ত সকলেই আছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের অবতার লীলার বিভিন্ন অভিনেতা রূপে অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্তের ভাষায়, ''শ্রীম'র মতো ভাগ্যধর'' নহেন। শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁহার স্মৃতিচারণে শ্রীমকে লিখিয়াছিলেন, ''ঠাকুরের সঙ্গে মাত্র চার-পাঁচ দিনের দেখা। কিন্তু ওই স্বল্প সময়ের মধ্যেই এমন হয়েছিল যে তাঁকে মনে হত যেন এক ক্লাসে পড়েছি, কেমন বেয়াদবের মতো কথা বলেছি। সম্মুখ থেকে সরে এলেই মনে হত 'ওরে বাপরে! কার কাছে গেছলাম!' ওই ক'দিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি, তাতে জীবন মধুময় করে রেখেছে। সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু, যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিইছি, সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো! আর তাঁর হাসিচ্যুত অমৃতকণায় আমেরিকা অবধি অমৃতায়িত হচ্ছে—এই ভেবে 'হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ, হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।' আমারই যদি এই, এখন বোঝো তুমি কেমন ভাগ্যধর!''

এই ভাগ্যধর শ্রীম প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে অসাধারণ সব বাক্যপুষ্পোপহার চয়ন করিয়া রাখা আছে। এটি নিত্যপাঠের স্বাধ্যায় গ্রন্থ। যে ইহা করিবে তাহার জীবন অমৃতায়িত হইয়া যাইবে, তাহার মন মোক্ষলুব্ধ হইবে।

কিন্তু গ্রন্থপাঠে নিজের জীবনের অনুপ্রেরণালাভই কি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পরম আপ্তি? আমরা স্বামী বিবেকানন্দের যে উদ্ধৃতি দিয়াছি সেখানে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যে ধর্মপ্রচার করিয়াছেন তাহা নবযুগধর্ম এবং এই নবযুগধর্ম সমগ্র জগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান।

কে সেই নব ভগীরথ যে এই অমৃত-নিষ্যন্দী-বাণী-প্রবাহকে শঙ্খনির্ঘোষে উদ্ঘোষিত করিয়া জগতের মৃতপ্রায় মনুষ্যজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবে? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে শ্রীরামকৃষ্ণ একদল তরুণকে পৃথকভাবে শিক্ষা দিতেছিলেন। শিক্ষা দিতেছিলেন ত্যাগে, বৈরাগ্যে, সাধনায়। তাঁহার অধ্যাত্মবীর্যের আধাররূপে কাশীপুর উদ্যানে এই তরুণগণ শ্রীগুরুর সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হইয়া সংঘবদ্ধ হন এবং গুরুর সেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনকে বিকশিত করিতে থাকেন। ইঁহাদের যে শিক্ষা, সে শিক্ষা, সে উপদেশ গৃহস্থজনের সম্মুখে হইত না। ইঁহাদের প্রধান ছিলেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ। তাঁহাকেও একান্তে কি শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা আমরা না জানিলেও অনুমান করিতে পারি যে এই ত্যাগব্রতী তরুণদলকে সংঘবদ্ধ করিয়া জগতে নবযুগধর্মের মহাযুগ-চক্র পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত করার শিক্ষাই দিতেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ, উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক যে দেহ তাহার দ্বারা যে কার্য সম্ভব ছিল না তাহাই করিবার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথকে কখনো তাঁহার নিজের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইতে দিতেন না। অসুস্থকালেও তাঁহার দেহের সেবার জন্য কখনো নরেন্দ্রনাথকে নিযুক্ত করেন নাই, কিন্তু তাঁহাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন আর একটি বিশাল কার্যের জন্য। সেই বিশাল কার্যের প্রস্তুতির মধ্যে নরেন্দ্রনাথকে দেহত্যাগের পূর্বে একান্তে তাঁহার সমগ্র শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেন এবং আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে বলেন, ''আজ তোকে সব দিয়ে ফকির হলুম।'' ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি নরেন্দ্রনাথ কি জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সত্তার গতিময় রূপ। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ''একটি আত্মাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'।'' সেইজন্যই রামকৃষ্ণ-ধর্ম প্রচারে এবং তাঁহার ব্যাখ্যাতারূপে স্বামী বিবেকানন্দের স্থান অনন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি কাগজে লিখিয়াছিলেন, ''নরেন শিক্ষে দিবে, যখন দূরে রহিবে হাঁক দিবে।'' এই কথাই সফল হইয়া উঠিয়াছিল যখন ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসভায় অখ্যাত অজ্ঞাত পরিচয়পত্রবিহীন একজন দণ্ডায়মান

www.udbodhan.org

হইয়া তাঁহার প্রথম ভাষণে উদ্গীত করিলেন তাঁহারই গুরুর একটি প্রধান শিক্ষা—যে শিক্ষা সর্বধর্মসমন্বয়ের। সুযোগ থাকিলেও তিনি তাঁহার গুরুর নাম উচ্চারণ করেন নাই। এই একটি বক্তৃতার পর অখ্যাত এই যুবক সমগ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়া গেলেন। তাহার পর শুরু হইল নবযুগচক্র পরিবর্তনের কর্মযজ্ঞ, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল তাঁহার গুরুর উপদেশের প্রকৃত মর্মোদ্ধারণ ও তাহার প্রচার। স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলিয়াছেন, "He led that wonderful life unconsciously and I read the meaning into it"—অর্থাৎ তিনি সেই অপূর্বজীবন যাপন করিয়াছিলেন যাহার সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন না এবং আমি ইহার অর্থ উদ্ঘাটন করি। সুতরাং ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খ্রীঃ হইতে ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে এই বাণীর প্রচার ব্যাখ্যা এবং কর্মে রূপায়ণ করিয়া গিয়াছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার দ্বারা। যদিও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ মতো সন্ন্যাসী সংঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং সেই সংঘকে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' তাঁহার গুরুদেবের উপদেশ মতো 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং অদ্বৈতবাদকে কর্মে পরিণত করার উপদেশ দিয়াছিলেন তবুও তাঁহার এই সব কর্মই গৃহস্থের জন্য, জনসাধারণের জন্য এবং স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য প্রবর্তিত। ইহা তিনি বহুস্থানে বলিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়টির চিন্তা করিলে ইহাই প্রতিভাত হয় যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে অনবদ্য এবং এই যুগের ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কিন্তু ইহার ব্যাপ্তি এবং পরিধি সীমিত। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সামগ্রিক, সার্বভৌমিক এবং কালোপযোগী পরিপূর্ণ প্রকাশ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনাতে নিবদ্ধ। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণকে ও তাঁহার বাণীকে সম্যক বুঝিবার গ্রন্থ নিঃসন্দেহে স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী এবং এই গ্রন্থাবলী এই যুগে বেদ ও উপনিষদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য। তবুও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বেদের একটি অংশরূপে পরিগণিত হইবে—প্রধানতঃ উপাসনা অংশ। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা তাঁহার গ্রন্থকে আশীর্বাদে ধন্য করিয়াছেন, বলিয়াছেন, "একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ওই কথা বলিতেছেন।" শ্রীম পরমভাগবত—তিনি ভক্তির আশ্রয়ে বেদরূপী শ্রীভগবানের ভক্তিসূচক বাক্যগুলিকেই প্রধানতঃ প্রকাশ করিয়া দৈনন্দিন জীবনে মানবকে চলার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ভূমিকা লিখিতে গিয়া অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি, কিন্তু ইহারও প্রয়োজন আছে। কেননা শ্রীরামকৃষ্ণরূপে যে বিরাট বোধিদ্রুম বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জগতের পথের নির্দেশক, সমূল সেই বোধিবৃক্ষকে না জানিলে শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব নয়।

কিন্তু পূর্বোল্লিখিত যে সমস্ত বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হইয়াছে তাহা হইতে যেন কেহ ইহা ধারণা না করেন যে আমরা শ্রীম'র বা তাঁহার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের অবমূল্যায়ন করিতেছি। স্মরণ রাখিতে হইবে আমাদের দৈনিক জীবনে এই গ্রন্থের আবশ্যকতা খুবই রহিয়াছে এবং ইহার নিত্যস্বাধ্যায় গৃহী সন্ন্যাসী সকলেরই নিত্যকর্তব্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পুনর্বার বলিতেছি অশ্বিনীকুমারের ভাষায়, পাঠ করিলে, "হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ, হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ।" সর্বকালের সর্বদেশের অধ্যাত্মজীবন-লিপ্সু মানবের পক্ষে এই গ্রন্থটি একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ এবং নিঃসন্দেহে ইহার পঠন-পাঠন অপরিহার্য।

বেলুড় মঠ **স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ**

জন্মাষ্টমী, ১৩৯৩

www.udbodhan.org